ইউনিট ৬
ভেষজ বৃক্ষ ও এদের প্রয়োজনীয়তা

ইউনিট ৬ ভেষজ বৃক্ষ ও এদের প্রয়োজনীয়তা

মানুষ পৃথিবীতে স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য রোগবালাইয়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন গাছপালা, লতাপাতা, ফুলফল, বাকল, মূল ও রসকষের ওপর নির্ভর করে আসছে। এ গাছপালা অর্থাৎ ভেষজ বৃক্ষ যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে রোগ নিরাময় ও ওষুধ শিল্পে উলে- খযোগ্য অবদান রেখে আসছে। প্রাচীনকালে এদের অবদান ব্যাপক হলেও ধীরে ধীরে চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎকর্ষতার ফলে ব্যাপকতা ক্রমে ক্রমে অনেক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দির দ্বারপ্রান্তে এসে মানুষ তথা বিজ্ঞানীরা পুনরায় ভেষজ বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন এবং নতুন নতুন তথ্যাদি আবিস্কারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন। যদি ভেষজ বৃক্ষের অতীত এতিহ্য পুনরুদ্ধার ও অজানা তথ্যাদি আবিস্কার করা সম্ভব হয় তাহলে বাংলাদেশ তথা বিশ্বের ওষুধ শিল্পের ও অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে।

এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে ভেষজ বৃক্ষ বলতে কী বুঝায়, এদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কয়েকটি ভেষজ বৃক্ষ, যেমন- নিম, অর্জুন, বহেড়া, হরিতকি, আমলকি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ৬.১ ভেষজ বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ভেষজ বৃক্ষ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ভেষজ বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

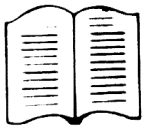

ভেষজ বৃক্ষ কী?

ভেষজ বৃক্ষ হলো এক প্রকার উদ্ভিদ যার যে কোন অংশ রোগ নিরাময়ে/রোগ উপশমে সক্ষম। ঐ রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা নির্ভর করে সে উদ্ভিদে অবস্থিত অ্যালকালয়েড (Alkaloid) বা উপক্ষার এর ওপর। উপক্ষার হলো ভেষজ উদ্ভিদে অবস্থিত নাইট্রোজেনঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা রোগ নিরাময় করে থাকে।

ভেষজ বৃক্ষ হলো এক প্রকার উদ্ভিদ যার যে কোনো অংশ রোগ নিরাময়ে/রোগ উপশমে সক্ষম।

ভেষজ বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা

ভেষজ বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ, মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভেষজ বৃক্ষ থেকে হরেক রকম জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরি কর আসছে। সভ্যতার আদিযুগে যখন আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল না, তখন রোগ নিরাময়ের একমাত্র উৎস ছিল ভেষজ উদ্ভদ তথা বৃক্ষ। কারণ, অসুখবিসুখে মানুষের কাছে তখন সবচেয়ে সহজলভ্য ছিল উদ্ভিদ/বৃক্ষ। এ ভেষজ উদ্ভিদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সে সময়কার চিকিৎসা ব্যবস্থা। ভেষজ উদ্ভিদের রোগ নিরাময়ের সে মূল্যবান অবদান আজও সভ্যজগতে স্বীকৃত। পরবর্তীতে এ উপমাহদেশেও ভেষজ বৃক্ষের ব্যবহার চরমে উঠেছিল। কিছু লোক ভেষজ গাছগাছরা সংগ্রহ ও ওষুধ তৈরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করে ক্রমান্বয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করে এবং সমাজে তারা এক বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। আজও অনেক কবিরাজ ও হেমিক তাদের সে সাফল্যের জন্য আমাদের নিকট চিরস্মরণীয়।

মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভেষজ বৃক্ষ থেকে হরেক রকম জীবন রক্ষাকারী ওষুধ তৈরি করে আসছে।

ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কৃত্রিম ওষুধ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা। ফলশ্রুতিতে ভেষজ ওষুধভিত্তিক প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে তার প্রাচীন ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলছে। এককালের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা ব্যবস্থা অবহেলা ও গবেষণার অভাবে হারিয়ে ফেলছে তার জনপ্রিয়তা।

দিনে দিনে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নত থেকে উন্নততর হওয়ার পিছনে ভেষজ উদ্ভিদের অবদান অনস্বীকার্য।

দিনে দিনে আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নত থেকে উন্নততর হওয়ার পিছনে ভেষজ উদ্ভিদের অবদান অনস্বীকার্য। আজও মানুষ অসুস্থ হলে যেসব ওষুধ ব্যবহার করে থাকে তার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ হতে উৎপন্ন। যেমন- মপ্রাচীনকালে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরের চিকিৎসায় বাবলার মূল ও নিমের ছাল এবং পাতা ব্যবহৃত হতো। তাছাড়া সিংকোনা নামক এক প্রকার লম্বা গাছের ছাল হতে টিঙ্কচার এবং বিচূর্ণক্রমে ওষুধ প্রস্তুত হয়। জ্বর, রস, রক্তক্ষয়, স্তন্যদান ও লালাস্রাবহেতু দুর্বলতা, উদরাময়, পেটফাঁপা, রক্তশ্রাব ও্লায়ুশুলে এটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এসব বৃক্ষের ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বর নিরাময় ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত। বর্তমান বিশ্বের মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সার নিরাময়ে আজও বিজ্ঞানীরা কোনো কার্যকরী ওষুধ আবিস্কার করতে পারেন নি। বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস এ ঘাতক ব্যাধির ওষুধ উদ্ভিদে লুকায়িত রয়েছে। এ লক্ষ্যে তারা কিছু উদ্ভিদ সারাবিশ্বে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং আশার কথা হলো অধিকাংশ উদ্ভিদই বাংলাদেশে শণাক্ত করেছেন।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগেও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোকের নিকট ভেষজ বৃক্ষের মাধ্যমে রোগ নিরাময় অতি সহজলভ্য ও জনপ্রিয়।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার যুগেও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোকের নিকট ভেষজ বৃক্ষের মাধ্যমে রোগ নিরাময় অতি সহজলভ্য ও জনপ্রিয়। কারণ, ভেষজ উদ্ভিদ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য, সস্তা ও সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিতে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। তাছাড়া ভেষজ ওষুধের তেমন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। পক্ষান্তরে, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তাদের নিকট ব্যয়বহুল ও সহজলভ্য নয়। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানে এ সনাতন চিকিৎসা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু গ্রামাঞ্চলে নয় বড় বড় শহরেও ইউনানি ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও ওষুধ জনপ্রিয়।

আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা উৎকর্ষতার চরমে পৌছলেও মানুষ আবার সে প্রাচীন ভেষজ বৃক্ষের ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। পৃথিবীর অনেক দেশে ভেষজ ওষুধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য নানা ধরনের গবেষণা শুরু হয়েছে যা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। আমাদের পাশ্ববর্তী দেশ ভারত এ ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বাংলাদেশে ভেষজ বৃক্ষের অবস্থা

বাংলাদেশ একসময় বিভিন্ন ভেষজ বৃক্ষে সমৃদ্ধ ছিল।

বাংলাদেশ একসময় বিভিন্ন বৃক্ষে সমৃদ্ধ ছিল। এদেশের পথে, ঘাটে, মাঠে বনেজঙ্গলে অসংখ্য ভেষজ বৃক্ষ দেখা যেতো। কিন্তু অবহেলায়, অব্যবস্থায় এবং ভেষজ বৃক্ষের প্রদান উৎপত্তিস্থল প্রাকৃতিক বনভূমি হ্রাস পাওয়ায় ঐসব মূল্যবান বৃক্ষসম্পদ হ্রাস পেয়েছে এবং অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। আজও হয়তো বাংলাদেশের আনাচেকানাচে অসংখ্য ভেষজ বৃক্ষ রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানিনা। দেশের জানা-অজানা ভেষজ বৃক্ষ ও তা থেকে ওষুধ তৈরির পদ্ধতি জানতে পারলে এ দেশেল আপামর জনসাধারণের রোগ নিরাময়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। বর্তমানে বাংলাদেশে ভেষজ ওষুধ তৈরিতে যেসব বৃক্ষের ব্যবহার হয় তার বেশিরভাগই আসে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে। এসব বৃক্ষ আমাদের দেশেও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগন্য। ব্যাপক আকারে ভেষজ বৃক্ষের চাষাবাদের মাধ্যমে অনেক মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব। ক্যান্সার রোগের নিরাময়ে বাংলাদেশের শণাক্তকৃত উদ্ভিদগুলো যদি গবেষণার ফলে কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয় তবে বাংলাদেশ ঐ উদ্ভিদগুলোর স্বত্ত্বাধিকার বলে অনেক লাভবান হবে এবং বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের বৃক্ষরাজির সমাদর বাড়বে। আর এজন্য প্রয়োজন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও গবেষণা।

ব্যাপক আকারে ভেষজ বৃক্ষের চাষাবাদের মাধ্যমে অনেক মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো সম্ভব।

সারমর্ম ঃ ভেষজ বৃক্ষ হলো এক প্রকার উদ্ভদ যার যে কোন অংশ রোগ নিরাময়ে/উপশমে সক্ষম। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নত থেকে উন্নতর হওয়ার পিছনে ভেষজ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোকের নিকট ভেষজ বৃক্ষের মাধ্যমে রোগ নিরাময় অতি জনপ্রিয়। কারণ, ভেষজ উদ্ভিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য, সস্তা ও তেমন কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে ভেষজ ওষুধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা বর্তমান বিশ্বের মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সার নিরাময়ের উপকরণ ভেষজ উদ্ভিদে রয়েছে। বাংলাদেশে ভেষজ বৃক্ষের ব্যাপক চাষাবাদ ও যত্নের মাধ্যমে ওষুধ শিল্পের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। ভেষজ বৃক্ষের রোগ নিরাময় ক্ষমতা কীসের ওপর নির্ভর করে?
- ক) বৃক্ষের আকার-আয়তনের ওপর
- খ) বৃক্ষমধ্যস্থিত অম্লের ওপর
- গ) বৃক্ষমধ্যস্থিত অ্যালকালয়েডের ওপর
- ঘ) বৃক্ষমধ্যস্থিত জলীয় অংশের ওপর

২। প্রাচীনকালে রোগ নিরাময়ের ওষুধের উৎস কী ছিল?
- ক) উদ্ভজ দ্রব্য
- খ) প্রাণীজ দ্রব্য
- গ) খণিজ দ্রব্য
- ঘ) কৃত্রিম দ্রব্য

৩। ক্যান্সার নিরাময়ে সম্ভাবনাময় উদ্ভিদের অধিকাংশ কোথায় পাওয়া গেছে?
- ক) পাকিস্তানে
- খ) আমেরিকায়
- ঘ) জাপানে
- গ) বাংলাদেশে

৪। বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগেও রোগ উপশমে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোকের নিকট ভেষজ বৃক্ষের এত সমাদরকেন?
- ক) রোগ নিরাময়ে খুবই কার্যকরি
- খ) সস্তা ও সহজলভ্য
- গ) দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়
- ঘ) সেবন করার পদ্ধতি সহজ

পাঠ ৬.২ নিম

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নিমের উৎপত্তি, বিস্তার, পরিচিতি, বংশবিস্তার, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং চারা উত্তোলন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- নিমের ভেষজ ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন।

নিমের বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Azadirachta indica (অ্যাজাডিরাক্টা ইন্ডিকা)*।

পরিবার ঃ মেলিয়েসি (Meliaceae)

বাংলাদেশের সর্বত্র নিম গাছ দেখা গেলেও উত্তরঙ্গে বেশি দেখা যায়।

উৎপত্তি ও বাংলাদেশে বিস্তার ঃ নিমের আদি বাসস্থান ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড। আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় নিম গাছ প্রচুর দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও নিম গাছ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে, শহরে, রাজপথের উভয় পাশে নিমের প্রজাতি দেখা যায়। তবে উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকায়, বেশি দেখা যায়। উত্তরাঞ্চলের উষ্ণ ও অবউষ্ণ এলাকায় বার্ষিক ৪৪৫-১১০০ মি.মি. বৃষ্টিপাতেও নিমের বৃষ্টি হয়। নিম অনুর্বর, অগভীর, কাঁকড়ময়, আর্দ্রতাহীন বালি মাটিতেও জন্মাতে পারে। তবে বন্যায় জমে যাওয়া পানিতে ভালো জন্মায় না।

নিম মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্রঝরা বৃক্ষ এবং প্রায় ২০ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ নিম মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্রঝরা বৃক্ষ এবং প্রায় ২০ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। অল্প সময়ের জন্য পত্রঝরা থাকে, মার্চ-এপ্রিল মাসে নতুন পাতা গজায়। বাকল খয়েরি বা কালো ও অমসৃণ। পত্র যৌগিক, পক্ষল, ২২-৪০ সে.মি. লম্বা, ৯-১৫টি পত্রক থাকে। পত্রকগুলো লম্বাটে, তির্যক ও বর্শাকৃতির হয়। পত্রফলকের কিনারা খাঁজকাটা। পত্রমূল প্রায় গোলাকার একজোড়া গ্রন্থিযুক্ত। ফুল কাক্ষিক, প্যানিকল মসৃণ ও সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ড্রুপ, ডিম্বাকৃতির, এককোষী এবং একটি বা কখনও কখনও দুটি বীজ থাকে। ফল পাকলে সবুজাভ হলুদ হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশিদিন থাকে না।

বংশবিস্তার ঃ সাধারণত বীজ দ্বারা বংশবিস্তার করা হয়। মূল/কান্ডের কাটিংয়ের মাধ্যমেও বংশবিস্তার করা যায়। নিমের কপিসিং ক্ষমতা খুবই ভালো।

বীজ সংগ্রহরে সময় ঃ জুন-জুলাই মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়। প্রতি কেজি বীজে ৩৩০০-৩৫০০টি বীজ থাকে।

গাছ থেকে সরাসরি বা গাছের নিচ থেকে ফল সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত বীজ গুদামজাত করা যায় না, তবে ২-৩ সপ্তাহের জন্য মুখবন্ধ পলিথিনে সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ গাছ থেকে সরাসরি বা গাছের নিচ থেকে ফল সংগ্রহ করা যায়। গোটা ফলটাই বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফল সংগ্রহের পর ছায়াযুক্ত জায়গায় ৩-৪দিন স্তুপ করে রেখে ফলের ত্বক পঁচাতে হয়। এরপর হাত দিয়ে কচলালে ফলত্বক আলাদা হয়ে যায়। পানিতে পরিস্কার করে ধুয়ে শুকনো ছায়াযুক্ত জায়গায় বীজ শুকাতে হয়। বীজ গুদামজাত করা যায় না। তাই সাথে সাথে নার্সারি বেডে বা পলিব্যাগে বপন করতে হয়। বীজ ১-৩ সপ্তাহের জন্য মুখবন্ধ পলিথিনে সংরক্ষণ করা যায়। তবে সপ্তাহে একবার বাতাসে খুলতে হয়। সাধারণত ১৬° সে. তাপমাত্রায় ও ৪০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় বীজ পাঁচমাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

জুন-জুলাই মাস নিম বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

চারা উত্তোলন ঃ জুন-জুলাই মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রতিটি পলিব্যাগে একটি করে বীজ বপন করা হয়। বীজ পলিব্যাগে বপন করার পর তার উপর ১-২ সে.মি. মাটি দিতে হবে। বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা গজায়। অঙ্কুরোদগম হার ১৫ ভাগ (সংরক্ষিত বীজ) এবং ৮৫ ভাগ (সদ্যজাত বীজ)। নার্সারি বেডেও বীজ বপন করা হয়। এক্ষেত্রে ১৫ সে.মি. উঁচু বালি দিয়ে বেড তৈরি করে ২.৫ সে.মি. গভীরে এবং ২-৫ সে.মি. দূরত্বে বীজ বপন করে হালকা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। হালকা

পানি দিতে হয় যাতে মাটি শক্ত না হয়। দুটি পাতা বের হলে জৈব মাটিযুক্ত বীজতলায় পুনরায় রোপণ করতে হয়। প্রায় ২-৩ মাস পরে ৭-১০ সে.মি. লম্বা হলে মাটিসহ চারা তুলে বা পলিব্যাগের চারা গর্তে রোপণ করতে হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ পাতা, মূল, কান্ড, বাকল, ফুল ও কাঠ।

নিমের বীজ, পাতা, মূল, কান্ড, বাকল ও ফুল বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময়ে; টুথপেস্ট, সাবান, ওষুধ শিল্পে ও কৃষি ফসলের ক্ষতিকারক পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ ব্যবহার ঃ নিমপাতার অসংখ্য ভেষজ ব্যবহার আছে। কপি পাতার সাথে গোলমরিচের পাতা মিশিয়ে অন্ত্রের কৃমির নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। পাতা পিষে মলম তৈরি করে বসন্তের সৃষ্ট ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহার করা যায়। নিমের বীজ ও তেজ পাতার মিশ্রণ শ্বেতি রোগের খুবই কার্যকরি ভেষজ ওষুধ। নিমপাতার রস ম্যালেরিয়াসহ সকল প্রকার জ্বরের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কচি পাতার জলীয় পরিস্রুত ফোটায় ফোটায় দেয়া হয় যা ফুলে যাওয়া গ্রন্থি, হাড়ভাঙ্গা ও মচকানোতে বেদনানাশক হিসেবে কাজ করে। পাতা ডায়রিয়া, পেটের পীড়া, যক্ষারোগ এবং বক্ষব্যাধি উপশমে উপশমে ব্যবহার করা যায়। পাতার রস মধুসহ জন্ডিসে ব্যবহৃত হয়। নিম গাছের ছাল বাতজ্বর, এন্টিঅ্যালার্জিক, দাদ, বিখাউজ, একজিমা, দাঁতে রক্ত ও পুঁজ পড়া, পায়ুরিয়া, জন্ডিস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। ছালের রস দাঁতের মাড়ি শক্ত করে। ছাল চূর্ণ করে লবণসহ খেলে ক্রিমিনাশ হয়। নিম গাছের ছাল থেকে "নিমবিডিন" তৈর করে বহু রোগের উপশন করা যায়। নিম তের টুথপেস্ট, সাবান, ওষুধ শিল্পে, কুষ্ঠরোগ, অ্যাজমা, ক্রিম, হেয়ার লোশন, কৃষি ফসলের ক্ষতিকারক পোকা দমনে ভেষজ হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভেষজ ব্যবহার ছাড়াও নিম কাঠ হিসেবে খুবই টেকসই এবং আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ছায়া প্রদানকারী, বায়ুরোধী ও শোভাবর্ধক হিসেবে নিমের ব্যবহার আছে।

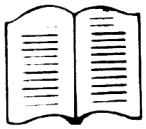

সারমর্ম ঃ নিম মেলিয়েসি পরিবারভুক্ত একপি পত্রঝরা বৃক্ষ। বাংলাদেশের সর্বত্র নিম গাছ দেখা যায়। তবে উত্তরাঞ্চলে ভালো জন্মে। নিম অনুর্বর, অগভীর, কাঁকড়ময় ও আর্দ্রতাহীন বালি মাটিতে জন্মাতে পারে। এটি বীজ, মূল/কান্ড কাটিংয়ের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। বাংলাদেশে জুন-জুলাই মাসে নিমের বীজ বপন করা হয়। বীজ গুদামজাত করা কষ্ঠসাধ্য তাই সাথে সাথে নার্সারি বেডে বা পলিব্যাগে বপন করা হয়। তবে পলিথিনের মুখ বন্ধ করে ২-৩ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়। গোটা ফলই বীজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে নিম বাংলাদেশে একটি পরিচিত গাছ। এটি বিভিন্ন প্রকার রোগ নিরাময়, টুথপেস্ট, সাবান, ওষুধ শিল্পে ও কৃষি ফসলের ক্ষতিকারক পোকা দমনে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর ম ল্যায়ন ৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। নিমের আদি বাসস্থান কোথায়?
- ক) নেপাল
- খ) ভুটান
- গ) বাংলাদেশ
- ঘ) পাকিস্তান

২। নিম কোন্ ধরনের উদ্ভিদ?
- ক) বৃক্ষ
- খ) গুল্ম
- গ) বীরুৎ
- ঘ) কোনটিই নয়

৩। নিমের বীজ ১৬° সে. তাপমাত্রায় ও ৪০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় কত মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়?
- ক) তিন মাস
- খ) পাঁচ মাস
- গ) সাত মাস
- ঘ) নয় মাস

৪। নিমের তেল কী কাজে ব্যবহৃত হয়?
- ক) মাথার চুল ওঠা রোধে
- খ) নানাবিধ জ্বরে
- গ) কৃষি ফসলের ক্ষতিকারক পোকা দমনে
- ঘ) হাঁপানি উপশমে

পাঠ ৬.৩ বহেড়া ও হরিতকি

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বহেড়ার উৎপত্তি, বিস্তার, পরিচিতি, বংশবিস্তার, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং চারা উত্তোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বহেড়ার ভেষজ ব্যবহার বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পারবেন।
- হরিতকির উৎপত্তি, বিস্তার, পরিচিতি, বংশবিস্তার, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং চারা উত্তোলন বর্ণনা করতে পারবেন।
- হরিতকির ভেষজ ব্যবহার বিস্তারিতভাবে লিখতে পারবেন।

বহেড়া

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Terminalia belerica (টারমিনালিয়া বেলেরিকা)*।

পরিবার ঃ কমব্রেটেসি (Combretaceae)।

বহেড়া চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও ময়মনসিংহের গজারি বনে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়।

উৎপত্তি ও বাংলাদেশে বিস্তার ঃ ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, মায়ানমার ও মালয়েশিয়া বহেড়ার আদি বাসস্থান। বহেড়া পরিকল্পিতভাবে চাষ করা হয় না। চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও ময়মনসিংহের গজারি বনে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। গ্রামাঞ্চলে অখ্যাত স্থানে কিছু গাছ দেখা যায়। যে কোনো মাটিতে বহেড়ার চারা রোপণ করা যায়। তবে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জমিতে/পাহাড়ের ঢালে ভালো জন্মে। বহেড়া সাময়িক জলাবদ্ধতা সহ্য করতে .....।

বহেড়া একটি বৃহদাকার, পত্রঝরা ও বহু শাখাপ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ বহেড়া একটি বৃহদাকার, পত্রঝরা ও বহু শাখাপ্রশাখা যুক্ত বৃক্ষ। পাতা একক ও ডালের শীর্ষে জড়োভাবে থাকে। পাতার বোটা লম্বা। ফুল সবুজাভ সাদা, ডিম্বাকৃতির, কাক্ষীয়, অসংখ্য এবং খুব ছোট। ফল পুষ্ট, ড্রুপ, গোলাকৃতির বা ইষৎ লম্বাটে এবং একটি করে বীজ থাকে। গাছের গুড়ি বেশ লম্বা, বাকল নীলাভ বা কালচে ধূসর ছাই বর্ণের, বেশি পুরু হয় না, সুরু ও ফাটলযুক্ত। কাঠ হরিদ্রাভ ও শক্ত; কিন্তু টেকসই নয়। ফুল আসার সময় ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস।

বংশবিস্ড়ার ঃ বহেড়া বীজ ও স্ট্যাম্প (মোথা) দ্বারা বংশবিস্তার করে। বহেড়ার কপিসিং ক্ষমতা মোটামুটি; কিন্তু পোলারডিং (Polllarding) ক্ষমতা ভালো নয়।

বীজ সংগ্রহের সময় ঃ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস। প্রতি কেজিতে প্রায় ২০০-২৫০টি বীজ থাকে।

একটি ফলে একটি বীজ থাকে। ঘরের তাপমাত্রায় বীজ ৬-১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ বহেড়া ফল পাকলে হালকা বাদামি রঙের হয়। ফল পাকলে গাছের নিচে ঝরে পড়ে এবং তখন তা সংগ্রহ করা হয়। একটি ফলে একটি বীজ থাকে। তাই ফল থেকে বীজ নিষ্কাশনের প্রয়োজন নেই। ঘরের তাপমাত্রায় বীজ ৬-১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তবে ফল সংগ্রহ করার একমাসের মধ্যেই বপন করা ভালো। কারণ যত দিন যাবে ততই চারা গজানোর ক্ষমতা কমতে থাকে।

পলিব্যাগে বীজ বপনের পূর্বে পানিতে ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে, পরে রোদে শুকিয়ে এবং আবার পানিতে ভিজিয়ে বপন করতে হয়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে চারা গজায়।

চারা উত্তোলন ঃ সাধারণত জানুয়ারির শেষ হতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। প্রতি পলিব্যাগে একটি করে বীজ বপন করা হয়। বীজ বপনের পূর্বে পানিতে ৪৮ ঘন্টা ভিজিয়ে পরে রোদে শুকিয়ে আবার পানিতে ভিজিয়ে তা বপন করতে হয়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে চারা গজায়। বীজ থেকে পলিব্যাগেও চারা তৈরি করা যায়। বীজ বপনের সাথে সাথে বীজতলায় ছায়া বা সেড দিতে হবে। প্রয়োজনমতো পানি সেচ দিতে হবে। যখন দরকার তখনই আগাছা বাছাই করতে হবে। জুন-জুলাই মাসে চারা ও স্ট্যাম্প রোপণ করা যায়। দুবছর বয়সের চারা লাগানোই উত্তম। তবে তিনচার মাসের চারা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ পাতা, ফল ও কাঠ।

বহেড়ার ফল ত্রিফলার একটি ফল যা পেটের পীড়া, অর্শ, কোষ্টকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও জ্বরে ব্যবহার্য।

ভেষজ ব্যবহার ঃ শে-মাজনিত রোগে ও গলাভাঙ্গায় বহেড়া চূর্ণ মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে উপকার হয়। শুষ্ক কাশিতে বহেড়া চূর্ণ ঘিয়ে ভেজে চিনির গাঢ় রসের সাথে গরম করে ছোট বড়ি করে কেলে উপকার হয়। বহেড়া বীজের শাঁস (বাদামের মতো) দুএকটি করে দু'ঘন্টা অন্তর এবং দিনে দুটি করে চিবিয়ে খেলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। রক্ত আমাশয়ে বহেড়া চূর্ণ সকালবিকাল পানিসহ খেলে উপকার হয়। বহেড়ার বীজের শাঁস অল্প পানি দিয়ে মিহি করে মাথার টাকে লাগালে টাক ভালো হয় এবং মুখে লাগালে মুখের ক্ষত ভালো হয়। কোথাও ফুলে গেলে বা কেটে গেলে বহেড়া মিহি করে কেটে প্রলেপ দিলে উপশম হয়। বহেড়ার বীজের শাঁস থেকে তৈরি তেল শ্বেতি রোগের সাদা জায়গায়লাগালো কিছুদিনের মধ্যে সে জায়গার বর্ণ স্বাভাবিক হয়। চোখ উঠলে বহেড়া চূর্ণ ঘষে চোখে লাগালে উপকার হয়। বহেড়া ফল ত্রিফলার একটি ফল, যা পেটের পীড়া, অর্শ, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও জ্বরে ব্যবহার্য। ফল হৃদপিন্ড, ফুসফুস, নাসিকা, গলার রোগ ও অজীর্ণতার ভালো ওষুধ। বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল মাথার চুলপড়া বন্ধ করে ও মাথা ঠান্ডা রাখে। ফল থেকে লেখার কালি বানানো যায়। ভেষজ ব্যবহার ছাড়াও এর নানাবিধ ব্যবহার আছে। বহেড়া গাছের কাঠ শক্ত কিন্তু ভঙ্গুর। পানিতে ভালো টেকে। কাঠ প্যাকিং বাক্স, তক্তা ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়। নৌকা তৈরিতেও ব্যবহার করা যায়।

হরিতকি

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Terminalia chebula (টেরমিনালিয়া চেবুলা)*।

পরিবার ঃ কমব্রেটেসি (Combretaceae)।

হরিতকি চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, ঢাকা, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও ময়মনসিংহের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মে থাকে।

উৎপত্তি ও বাংলাদেশে বিস্তার ঃ ভারত হরিতকির আদি বাসস্থান। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ পেনিনসুলা, শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে এর বিস্তৃতি রয়েছে। বাংলাদেশে হরিতকির পরিকল্পিত কোনো বাগান নেই। গ্রামাঞ্চলের গৃহচত্বরে, রাস্তার পার্শ্বে লাগানো হয়। চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, সিলেট, ঢাকা, টাঙ্গাইল, শেরপুর, ময়মনসিংহের বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকবাবে জন্মে থাকে। পাহাড়ের ঢালুতেও চাষ করা যায়। ভিজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটি এটি চাষের উপযোগী তবে সকল মাটিতেই জন্মে।

হরিতকি একটি মাঝারি থেকে বৃহদাকার পত্রঝরা বৃক্ষ এবং প্রায় ১৫-২০ মি. উঁচু হয়ে থাকে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ হরিতকি একটি মাঝারি থেকে বৃহদাকার পত্রঝরা বৃক্ষ এবং প্রায় ১৫-২০ মি. উঁচু হয়ে থাকে। বাকল গাঢ় বাদামি বর্ণের। বাকল লম্বা ফাঁটলযুক্ত। পাতা সরল, একান্তর, উপবৃত্তাকার, সবৃন্তক। ফুল উভলিঙ্গ, শ্বেতবর্ণ, ছোট, স্পাইকে থাকে। ফল ড্রুপ, উগ্রগন্ধবিশিষ্ট লম্বাকৃতির, দুমুখ সুঁচালো, মসৃণ, কমবেশি ৫টি হালকা খাঁজ থাকে, পাকলে হলুদাভ সবুজ রঙ হয়।

বংশবিস্তার ঃ বীজ ও স্ট্যাম্প কাটিং দ্বারা বংশবিস্তার করা হয়।

বীজ সংগ্রহের সময় ঃ হরিতকির বীজ নভেম্বর হতে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। প্রতি কেজিতে ১০০-১৫০টি বীজ থাকে।

হরিতকির পাকা ফল গাছ হতে মাটিতে পড়লে তা সংগ্রহ করা উত্তম। ফল ঘরের শুষ্ক জায়গায় ছড়িয়ে ২-৩ মাস রাখা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ পাকা হরিতকির রঙ হলুদ হয়, ফলের গায়ে ৫টি কারো দাগ থাকে। পাকা ফল গাছ হতে মাটিতে পড়লে তা সংগ্রহ করা উত্তম। তবে গাছে চড়ে ডাল ঝাঁকি দিয়ে পাকা ফল মাটিতে ফেলে তা সংগ্রহ করা যায় বা হাতের নাগালে পেলে সরাসরি গাছ হতেও পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। হরিতকির ত্বক খুব শক্ত। ফল সংগ্রহের পর ছুটি দিয়ে ফলত্বক কেটে বীজ বের করা হয়। একটি ফলে একটি বীজ থাকে। গোটা ফল ঘরের শুষ্ক জায়গায় ছড়িয়ে ২-৩ মাস রাখা যায়। ফলত্বক কেটে বীজ বের করার পর সংরক্ষণ করা যায় না।

পলিব্যাগে বীজ বপনের পূর্বে ৪৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়।

চারা উত্তোলন ঃ জানুয়ারির শেষ হতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। প্রতি পলিব্যাগে একটি করে বীজ লাগানো হয়। বীজ বপনের পূর্বে ৪৮ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। বপনকৃত বীজ থেকে ২৫-৩০ দিনের মধ্যে চারা গজায়। বীজ বপন করার পর বেডে সেড/ছায়া দিতে হবে। প্রতিদিন প্রয়োজন অনুসারে পানি সেচ দিতে হবে। পানি পড়ন্ত বিকেলে দেয়া উত্তম। এক বৎসরের চারা জুন-জুলাই মাসে লাগাতে হবে। তবে চারপাঁচ মাস বয়সের চারা মাঠে লাগানো যায়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ ফল ও কাঠ।

হরিতকি ত্রিফলার একটি অন্যতম ফল। এটি অর্শ, পিত্তশূল, হাঁপানি, চর্মরোগ, আমাশয়, রক্তশূন্যতা, হৃদরোগ, গেটেবাত ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য।

ভেষজ ব্যবহার ঃ হরিতকির ফলের বিভিন্ন রকমের ভেষজ ব্যবহার আছে। আয়ুর্বেদিক ওষুধ ত্রিফলার অন্যতম পর হরিতকি। হরিতকি ফল চূর্ণ করে একটু লবণ মিশিয়ে সেব করলে অর্শ্বরোগ নিরাময় হয় এবং অল্প গাওয়া ঘিয়ের সাথে মিশিয়ে সেবন করলে পিত্তশূলে উপকার হয়। হরিতকি চূর্ণ পাইপে ভরে ধূমপান করলে হাঁপানি উপশম হয়। রক্ত দূষিত বা পিত্তরোগজনিত চর্মরোগে নিসিন্দা পাতার রসের সঙ্গে হরিতকি চূর্ণ করে খেলে উপহার হয়। যে কোন ক্ষতে হরিতকি পোড়া ছাইয়ের সাথে মাখন মিশিয়ে লাগালে ঘা সেরে যায়। চিনি ও পানির সাথে হরিতকি চূর্ণ করে ব্যবহার করলে চোখ উঠা ভালো হয়। হরিতকি বলকারক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বার্ধক্য নিবারক। ফল থেকে ট্যানিন, লেখার কালি ও রঙ পাওয়া যায়। কাঁচা ফল আমাশয় এবং পাকা ফল রক্তশূন্যতা, পিত্তরোগ, হৃদরোগ, পেটবাত ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য। ফলচূর্ণ দন্তরোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। ভেষজ ব্যবহার ছাড়াও কাঠ জ্বালানি, আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়।

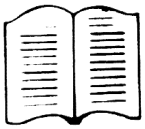

সারমর্ম ঃ বহেড়া এবং হরিতকি দুটিই কমব্রেটেমি পরিবারভুক্ত পত্রঝরাজাতীয় ভেষজ বৃক্ষ। দুটি প্রজাতিই বীজ ও স্ট্যাম্প দ্বারা বংশবিস্তার করা হয়। এদের প্রতিটি ফলে একটি করে বীজ থাকে। সাধারণত জুন-জুলাই মাসে এদের চারা ও স্ট্যাম্প রোপণ করা হয়। উভয়ই ত্রিফলার অন্যতম পল এবং নানাবিধ রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বহেড়া পেটের পীড়া, অর্শ্ব, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, জ্বর, হাঁপানি, মাথঅর টাক পড়া, মুখের ক্ষত, চোখ উঠা প্রভৃতি রোগ উপশমে ব্যবহার্য। হরিতকি বলকারক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক, বার্ধক্য নিবারক ছাড়াও আমাশয়, রক্তশূন্যতা, পিত্তরোগ, হৃদরোগ, পেটেবাত, দন্তরোগ ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। বহেড়ার বৈজ্ঞানিক নাম কোন্‌টি?
- ক) *Terminalia belerica*
- খ) *Terminalia chebula*
- গ) *Terminalia arjuna*
- ঘ) *Terminalia catappa*

২। বহেড়া প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের কোথায় জন্মে?
- ক) সুন্দরবনে
- খ) চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে
- গ) বসতবাড়িতে
- ঘ) রাজশাহীতে

৩। বহেড়ার বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময় কখন?
- ক) জুন-জুলাই মাসে
- খ) আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে
- গ) নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে
- ঘ) মার্চ-এপ্রিল মাসে

৪। বহেড়ার ভেষজ ব্যবহার কোন্‌টি?
- ক) বীজের তেল চুল উঠা বন্ধ করে ও মাথা ঠান্ডা রাখে
- খ) গাছের ছাল বাতজ্বর, দাদ ও বিখাউজ উপশম করে
- গ) ফল রক্তশূন্যতা, পিত্তরোগ ও হৃদরোগ নিরাময় করে
- ঘ) পাতা হৃদরোগ আরোগ্য করে

৫। এক কেজি হরিতকির বীজে কয়টি বীজ হয়?
- ক) ১০০০-১২০০টি
- খ) ৩০০-৫০০টি
- গ) ২০০-২৫০টি
- ঘ) ১০০-১৫০টি

৬। হরিতকি ফলের ভেষজ ব্যবহার কোন্‌টি?
- ক) ফলের রস যকৃত, পেটের পীড়া, হজমী ও কাশিতে বিশেষ উপকারি
- খ) হরিতকির চূর্ণ পাইপে ভরে ধুমপান করলে হাঁপানি রোগের উপশম হয়
- গ) ফল হৃদপিন্ড, ফুসফুস, নাসিকা ও গলার রোগের ভালো ওষুধ

ঘ) ফল থেকে শ্যাম্পু ও চুলের কলপ তৈরি হয়

পাঠ ৬.৪ আমলকি ও অর্জুন

এ পাঠ শেষে আপনি -

- আমলকির উৎপত্তি, বিস্তার, পরিচিতি, বংশবিস্তার, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং চারা উত্তোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আমলকির ভেষজ ব্যবহার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্জুনের উৎপত্তি, বিস্তার, পরিচিতি, বংশবিস্তার, বীজ সংরক্ষণ এবং চারা উত্তোলন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- অর্জুনের ভেষজ ব্যবহার আলোচনা করতে পারবেন।

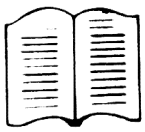

আমলকি

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Phyllanthus officinalis (ফাইলেনথাস অফিসিনালিস)*।

পরিবার ঃ ইউফরবিয়েসি (Euphorbiaceae)।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের গৃহচত্বরে, রাস্তার পাশে, সামাজিক বনে আমলকির গাছ দেখা যায়।

উৎপত্তি ও বাংলাদেশে বিস্তার ঃ ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, চীন আমলকির আদি বাসস্থান। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের গৃহচত্বরে, রাস্তার পাশে, সামাজিক বনে আমলকির গাছ দেখা যায়। চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ভাওয়াল, মধুপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহের মিশ্র শুষ্ক বনাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। গভীর, আর্দ্র, দোআঁশ মাটিতে আমলকির চাষ ভালো হয়। তবে ক্ষারীয় বা অনুর্বর মাটিতেও চাষ করা যায়।

আমলকি ছোট বা মাঝারি আকারের পত্রঝরা গাছ। এর শাখাপ্রশাখা অল্প এবং ১০-১৫ মি. উঁচু হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ আমলকি ছোট বা মাঝারি আকারের পত্রঝরা গাছ। এর শাখাপ্রশাখা অল্প এবং ১০-১৫ মি. উঁচু হয়। বাকল ধূসর হলুদ বক্রতল স্কেলের মতো স্থূল, নরম, মসৃণ এবং ভিতরে গাঢ় লাল। কান্ড গাঁটযুক্ত। পাতা যৌগিক, উপপত্র বিপরীতভাবে বিন্যস্ত। ফুল ছোট, সবুজাভ হলুদ, বৃন্তহীন, একলিঙ্গ, সহবাসী, গুচ্ছাকারে কাক্ষীয়। ফল ড্রুপ, রসালো, মাংসল, সবুজ, গোলাকৃতির এবং ব্যাস ২-৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে, মুখরোচক ও উপাদেয়। ফুল আসার সময় মার্চ থেকে মে মাস।

বংশবিস্তার ঃ আমলকি বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। এছাড়া বাডিং ও কাটিং প্রক্রিয়ায় কৃত্রিমভাবে বংশবিস্তার করা যায়। এর কপিসিং ও পোলারডিং ক্ষমতা আছে।

বীজ সংগ্রহের সময় ঃ নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়। এক কেজিতে ৩৮০০-৪০০০টি বীজ থাকে।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ গাছ হতে সরাসরি অথবা গাছের নিচের মাটি হতে ফল সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত ফল স্তুপ করে অথবা বস্তায় ভরে ভিজিয়ে রাখতে ৭/৮ দিন পরে ফলের উপরের রসালো অংশ পঁচে যায়। তখন একটি পাত্রে নিয়ে পানি দিয়ে কচলালে রসালো অংশ আলাদা হয়ে যায় এবং আঁটিগুলো নিচে জমা হয়। অতঃপর পানি সরিয়ে আঁটিগুলো পৃথক করা হয় এবং পানিতে ধুয়ে পরিস্কার করা হয়। এগুলো রোদে শুকালে আঁটিগুলো ফেটে যায় এবং আঁটি হতে ৪/৫টি করে বীজ বের হয়। বীজ বায়ুতে শুকিয়ে বয়ামে ভরে কিছুদিন রাখা যায়।

বীজ বপনের পর সেড/ছায়া দিতে হয় এবং ৪০ দিন পর সেড সরিয়ে দিতে হয়।

চারা উত্তোলন ঃ প্রতি পলিব্যাগে ২টি করে বীজ বপন করা হয়। চারা গজাতে ১০-১২ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের পর সেড/ছায়া দিতে হয় এবং ৪০ দিন পর সেড সরিয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনমতো আগাছা বাছাই করতে হয়। প্রয়োজন অনুসারে সকাল ও বিকেলে পানি সিঞ্চন করতে হয়। চারার বয়স যখন ৫/৬ মাস হয় তখন চারা লাগানো যায়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ ফল, পাতা, ছাল, শিকড় ও কাঠ।

আমলকির ফল ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল। ফলের রস যকৃত, পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হজমী ও কাশিতে বিশেষ উপকারী।

ভেষজ ব্যবহার ঃ আমলকির ফল ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল। ফলের রস যকৃত, পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হজমী ও কাশিতে বিশেষ উপকারী। ফল চলি- শদিন ভক্ষণ করলে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি হয় বলে কথিত আছে। আমলকির ফল ত্রিফলার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রক্তহীনতা, পান্ডু বা জন্ডিস, চর্মরোগ, ডায়রিয়া, গনোরিয়া, চুন উঠা, জ্বর, হিক্কা প্রভৃতি রোগেরও উপশম করে। ফল থেকে লেখার কালি, শ্যাম্পু ও চুলের কলপ তৈরি হয়। ফুল, শিকড় ও বাকল থেকেও ওষুধ তৈরি করা যায়। আমলকি পাতার রস আমাশায় প্রতিষেধক এবং টনিক। পাতা থেকে প্রাপ্ত রঙ সিল্কের শাড়ি রঙানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। ভেষজ ব্যবহার ছাড়াও আমলকির কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অর্জুন

বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Terminalia arjuna (টারমিনালিয়া অর্জুনা)*।

পরিবার ঃ কমব্রেটেসি (Combretaceae)।

বাংলাদেশে বন এলাকার বাইরে বসতবাড়িতে, সড়কের পাশে লাগানো হয়ে থাকে।

উৎপত্তি ও বাংলাদেশে বিস্তার ঃ উত্তরপশ্চিম ভারতের সাব-হিমালয় এলাকা, দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকা অর্জুনের আদি বাসস্থান। বাংলাদেশে বন এলাকার বাইরে বসতবাড়িতে, সড়কের পাশে লাগানো হয়ে থাকে। রাজশাহী-নাটোর জেলায় রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেক অর্জুনের গাছ আছে। সড়কের পাশে, বাঁধের ঢালের নিচু অংশে, পুকুর বা ডোবার পাশে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় জন্মানো যায়। সাধারণত ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে উর্বর ও দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মায়। এ গাছ আধা ছায়া সহ্য করতে পারে কিন্তু পূর্ণ ছায়ায় জন্মাতে পারে না, তবে উন্মুক্ত স্থানেই ভালো হয়। সাময়িক জলাবদ্ধতায় টিকে থাকতে পারে।

অর্জুন মাঝারি থেকে বৃহদাকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ। পরিণত বয়সে গাছ ১০-২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। মাথা ছড়ানো এবং ডাল নিচের দিকে ঝুলে থাকে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ অর্জুন মাঝারি থেকে বৃহদাকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ। পরিণত বয়সে গাছ ১০-২০ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। গাছটির মাথা ছড়ানো, ডালগুলি নিচের দিকে ঝুলানো থাকে। কান্ড সাধারণত খুব লম্বা ও সোজা হয় না। তবে সরল, উন্নত, মসৃণ এবং আকর্ষনীয় হয়ে থাকে। বাকল মসৃণ, ধূসর বর্ণের ও খুব মোটা এবং পাতলা স্তরে স্তরে বিভক্ত। গাছ থেকে সহজে ছাল উঠানো যায়। পাতা লম্বা ডিম্বাকৃতির, জিহ্বাকৃতির, সরল, কিছুটা বিপরীত এবং ক্ষুদ্র প্রশাখা বিপরীত ভঙ্গিতে বিন্যস্ত। ফুল হলুদাভ স্পাইক সোজা, অত্যন্ত ছোট, উগ্র গন্ধ এবং ফুলে কোনো পাপড়ি নেই। ফল দেখতে কামরাঙ্গার মতো, পাঁচ খাঁজবিশিষ্ট। কিন্তু আকৃতিতে ছোট, ডিম্বাকৃতি, শক্ত ও অসংখ্য। ফুল আসার সময় এপ্রিল থেকে মে মাস।

বংশবিস্ড়ার ঃ বীজ, স্ট্যাম্প (মোথা), রুট সাকার ইত্যাদির মাধ্যমে বংশবিস্তার করা যায়। এছাড়া এর কপিসিং ক্ষমতা আছে।

বীজ সংগ্রহের সময় ঃ মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে বীজ সংগ্রহ করা হয়। প্রতি কেজিতে বীজের সংখ্যা প্রায় ৮০০-১০০০টি।

পরিপক্ক বীজ গাছ হতে সংগ্রহ করা ভালো। ৬-১২ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ঃ অর্জুন বীজ দেখতে কামরাঙ্গার মতো। পরিপক্ক বীজ গাছ হতে সংগ্রহ করা ভালো। গাছে শুকানো বীজ সংগ্রহ করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা প্রায় ৮০ ভাগ হয়। এক্ষেত্রে গাছে উঠে ঝাঁকি দিলে শুকনো বীজ মাটিতে পড়ে। তখন মাটি হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ সংগ্রহের পর ভালোভাবে শুকিয়ে প্লাস্টিকের বস্তায় মুখ বেঁধে রাখা হয়। এভাবে ৬-১২ মাস পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

বীজ সামান্য বাঁকা করে ১ সে.মি. মাটির গভীরে পুততে হয়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে চারা গজায়।

চারা উত্তোলন ঃ সরাসরি পলিব্যাগে বা বেডে বপন করা হয়। বীজ সামান্য তেরছা (বাঁকা) করে ১ সে.মি. মাটির গভীরে পুততে হয়। প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ দিতে হয়। বীজ দেয়ার পর পলিব্যাগ/বেড খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, তাতে তাড়াতাড়ি চারা গজায়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে চারা গজায়। চারা গজানোর পর সেড/ছায়ার প্রয়োজন হয়। প্রায় ৩০ দিন পর সেড সরিয়ে দিতে হয়। পলিব্যাগের বাইরে কোনো শিকড় থাকলে তা কেটে দিতে হয়। বিকেল বেলা চারা বাছাই করার উপযুক্ত সময়। বাছাই করার আগে ও পরে চারার পানি সেচ দিতে হয়। চারা রোপণ করার ২ সপ্তাহ আগে গ্রেডিং করতে হয়। আঁকাবাঁকা চারা রোপণযোগ্য নয়। প্রায় ১০০ দিন বয়সের চারা রোপণ করা উত্তম।

ব্যবহার অংশ ঃ পাতা, ছাল, ফল ও কাঠ।

অর্জুনের পাতা, ছাল ও ফল বিভিন্ন রোগ, যেমন– হৃদরোগ, অর্শ, উদরাময়, হাড়ভাঙ্গা, শ্বেত বা রক্ত প্রদর, রক্ত আমাশয়, হাঁপানি ইত্যাদি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

ভেষজ ব্যবহার ঃ কাঁচা পাতার রস আমাশয় রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের ছাল ভালোভাবে পেষণ করে তার রস চিনি ও দুধের সাথে প্রত্যেহ সকালে সেবনে যাবতীয় হৃদরোগ আরোগ্য হয়। বুক ধড়ফড় করে কিন্তু উচ্চ রক্তচাপ নেই সেক্ষেত্রে অর্জুনের ছাল দুধ ও পানির সাথে মিশিয়ে নিয়মিত সেবনে উপশম হয়। নিম্ন রক্তচাপ থাকলে অর্জুনের ছাল সেবনে উপকার হয়। ছালের ক্বাথ সেবনে উদরাময় ও অর্শ রোগের উপশম হয়। ছাল ও রসুন বেটে ভাঙ্গা স্থানে বেঁধে রাখলে হাড় জোড়া লাগে। কোথা থেকে রক্ত পড়লে ৫/৬ গ্রাম ছাল রাত্রিতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেকে পানি খেলে আরোগ্য হয়। শ্বেত বা রক্তপ্রদরে ছাল ভিজানো পানি আধ চামচ কাঁচা হলুদের রস মিশিয়ে খেলে উপশম হয়। রক্ত আমাশয়ে অর্জুন ছালের চূর্ণ ছাগলের দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে রোগ নিরাময় হয়। অর্জুন ছালের মিহি গুঁড়ো মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মুখে লাগালে মুখে মেছতার দাগ মিলিয়ে যায়। হাঁপানিতে অর্জুন ফল টুকরো টুকরো করে তামাকের মতো ধোঁয়া টানলে উপাকার পাওয়া যায়।

ভেষজ ব্যবহার ছাড়াও অর্জুন কাঠ গৃহনির্মাণ, গরুর গাড়ির চাকা, কৃসি উপকরণ, জলযান, নৌকা, দাড়, মাস্তুল, খণি ও নলকূপ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

সারমর্ম ঃ আমলকি ও অর্জুন বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মায়। আমলকি গভীর, আর্দ্র ও দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়। অর্জুন স্যাঁতস্যাঁতে উর্বর ও দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মায়। উভয়ই পত্রঝরাজাতীয় ভেষজ বৃক্ষ। আমলকির গাছ বীজ, বাডিং ও কাটিংয়ের দ্বারা এবং অর্জুন গাছ বীজ, স্ট্যাম্প ও রুট সাকার দ্বারা বংশবিস্তার করে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে আমলকির বীজ সংগ্রহ করা হয়; অর্জুনের বীজ সংগ্রহ করা হয় মার্চ ও এপ্রিল মাসে। আমলকির বীজ বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না, কিন্তু অর্জুনের বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরে প্রায় ১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। আমলকি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। এটি ত্রিফলার একটি ফল। ফলের রস যকৃত, পেটের পীড়া, অজীর্নতা, হজমী ও কাশিতে বিশেষ উপকারী। তাছাড়া পাতা, ফুল, শিকড় ও বাকল বহুবিধ রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। অর্জুনের পাতা, ছাল ও ফল বিভিন্ন রোগ, যেমন– হৃদরোগ, অর্শ, উদরাময়, হাড়ভাঙ্গা, শ্বেত বা রক্ত প্রদর, রক্ত আমাশয়, হাঁপানি ইত্যাদি নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কোন্ মাটিতে আমলকির চাষ ভালো হয়?
- ক) বেলে ও শুষ্ক মাটিতে
- খ) অগভীর ও অনুর্বর মাটিতে
- গ) অম্লীয় বা ক্ষারীয় মাটিতে
- ঘ) গভীর, আর্দ্র ও দোআঁশ মাটিতে

২। পরিণত বয়সে আমলকির গাছ কতটুকু উঁচু হয়?
- ক) ৭-১২ মি.
- খ) ১০-১৫ মি.
- গ) ১৫-২০ মি.
- ঘ) ২০-৩০ মি.

৩। আমলকি ফলে কোন্ ভিটামিন বেশি থাকে?
- ক) ভিটামিন এ
- খ) ভিটামিন বি
- গ) ভিটামিন সি
- ঘ) ভিটামিন ডি

৪। অর্জুনের ফল দেখতে কেমন?
   ক) বড়ইয়ের মতো
   খ) জলপাইয়ের মতো
   গ) আমড়ার মতো
   ঘ) কামরাঙ্গার মতো

৫। অর্জুনের বীজ গাছ থেকে শুকনো অবস্থায় সংগ্রহ করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা % হয়?
   ক) প্রায় ৯০%
   খ) প্রায় ৮০%
   গ) ৭০%
   ঘ) ৬০%

৬। অর্জুন গাছের কাঁচা পাতার রস কী রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
   ক) আমাশয়
   খ) চোখ উঠায়
   গ) জ্বরে
   ঘ) জন্ডিসে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন – ইউনিট ৬

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। ভেষজ বৃক্ষ বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভেষজ বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
২। নিম গাছের পরিচিতি, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ভেষজ ব্যবহার আলোচনা করুন।
৩। বহেড়ার উৎপত্তি ও বিস্তার, চারা উত্তোলন এবং ভেষজ ব্যবহার বর্ণনা করুন।
৪। হরিতকির উৎপত্তি ও ভেষজ ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৫। আমলকির বংশবিস্তার, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং ভেষজ ব্যবহার আলোচনা করুন।
৬। অর্জুনের পরিচিতি, চারা উত্তোলন ও ভেষজ ব্যবহার বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা – ইউনিট ৬

পাঠ ৬.১

১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। খ

পাঠ ৬.২

১। গ ২। ক ৩। খ ৪। গ

পাঠ ৬.৩

১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ঘ ৬। খ

পাঠ ৬.৪

১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। খ ৬। ক